আধুনিক পদ্ধতিতে মসলা চাষ (আদা ও হলুদ)

বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল

একই সাথে আদা হলুদ চাষ

মেয়াদ ঃ ০৫ দিন

সম্পাদনা

কৃষিবিদ মোহাম্মদ সায়েদুল হক

সহযোগিতায়

কৃষিবিদ আজমারুল হক

মোঃ মাঈনুদ্দীন

ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)

বাড়ী-১৮, রোড-০৫, ব্লক-এ মিরপুর-০২, ঢাকা-১২১৬।

ফোন ও ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৯০০৫৪৫২,৮৮০-২-৯০১৪৯৩৩,

E-mail ঃ zalam_idf@yahoo.com

মসলা চাষ (আদা ও হলুদ) বিষয়ক প্রশিক্ষণ এর সময়সূচী

দিন	সময়	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	ফ্যাসিলিটেটর
১ম দিন	০৯:০০-১০.০০	• রেজিষ্ট্রেশন • প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী • আইডিএফ পরিচিতি, এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য • উদ্বোধন	বক্তৃতা, লিফলেট মাল্টিমিডিয়া,	
	১০:০০-১১:৩০	• ভূমিকা • আদা হলুদ চাষের গুরুত্ব • আদা ও হলুদের জাত পরিচিতি • পার্বত্য অঞ্চলে আদা হলুদ চাষের সম্ভাবনা	বক্তৃতা, লিফলেট মাল্টিমিডিয়া,	
	১১:৩০-১২:০০	চা বিরতি		
	১২.০০-১.৩০	• আদা হলুদ চাষের জন্য জমি নির্বাচন • কন্টুর পদ্ধতিতে চাষের বেলায় বিবেচ্য বিষয়: - জমি তৈরী, মাটির ক্ষয়রোধে হেজ প্ল্যান্ট লাগানো	বক্তৃতা, লিফলেট মাল্টিমিডিয়া,	
	১.৩০-২.৩০	দুপুরের খাবারের বিরতি		
	২:৩০-৪:৩০	• আদা হলুদ ক্ষেতে মালচ হিসেবে কচুরিপানা ব্যবহার • সার হিসেবে কচুরিপানার ব্যবহার • জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ	বক্তৃতা, লিফলেট মাল্টিমিডিয়া,	
	০৪:৩০-০৫:০০	দিনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা		
২য় দিন	০৯:০০-১১:৩০	• আদা হলুদের রোগ ব্যবস্থাপনা • আদা হলুদের পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা	বক্তৃতা, লিফলেট মাল্টিমিডিয়া,	
	১১:৩০-১২:০০	চা বিরতি		
	১২:০০-১:৩০	• আদা হলুদের সাথে চাষের জন্য সাথী ফসল নির্বাচন • সাথী ফসল চাষ ব্যবস্থাপনা	বক্তৃতা, লিফলেট মাল্টিমিডিয়া,	
	১.৩০-২.৩০	দুপুরের খাবারের বিরতি		
	২.৩০-৪.৩০	• আদা হলুদ ক্ষেতে সেচ ব্যবস্থাপনা • সাথী ফসলে সেচ ব্যবস্থাপনা	বক্তৃতা, লিফলেট মাল্টিমিডিয়া,	
	০৪:৩০-০৫:০০	দিনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা		
৩য় দিন	০৯:০০-১১:৩০	• আদা হলুদ সংগ্রহ • গ্রেডেশন	বক্তৃতা, লিফলেট মাল্টিমিডিয়া,	
	১১:৩০-১২:০০			
	১২:০০-১:৩০	• বীজের জন্য আদা হলুদ বাছাই ও সংরক্ষণ	বক্তৃতা,লিফলেট,মাল্টিমিডিয়া,	
	১.৩০-২.৩০	দুপুরের খাবার বিরতি		
	২.৩০-৪.৩০	• শস্য পর্যায় অনুসারে চাষের প্রয়োজনীয়তা • আদা হলুদের বাজার ব্যবস্থাপনা	বক্তৃতা, লিফলেট মাল্টিমিডিয়া,	
	০৪:৩০-০৫:০০	দিনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা		
৪র্থ দিন	০৯:০০-১১:৩০	জমিতে চাষ মই ,জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ	ব্যবহারিক, মাঠ পরিদর্শন	
	১১:৩০-১২:০০	চা বিরতি		
	১২:০০-১:৩০	বীজ আদা হলুদ বাছাই, ট্রিটমেন্ট, বপন, সারি তৈরী, মালচিং	ব্যবহারিক, মাঠ পরিদর্শন	
	১.৩০-২.৩০	দুপুরের খাবার বিরতি		
	২.৩০-৪.৩০	সেচ, নিড়ানি, আন্তঃপরিচর্যা	ব্যবহারিক, মাঠ পরিদর্শন	
	০৪:৩০-০৫:০০	দিনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা		
৫ম দিন	০৯:০০-১১:৩০	আদা হলুদ সংগ্রহ, গ্রেডেশন	ব্যবহারিক, মাঠ পরিদর্শন	
	১১:৩০-১২:০০	চা বিরতি		
	১২:০০-১:৩০	বীজের জন্য আদা হলুদ বাছাই ও সংরক্ষণ	ব্যবহারিক, মাঠ পরিদর্শন	
	১.৩০-২.৩০	দুপুরের খাবার বিরতি		
	২.৩০-৪.৩০	প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ও পুর্ণালোচনা	ব্যবহারিক, মাঠ পরিদর্শন	
	০৪:৩০-০৫:০০	সমাপনী		

সেসন ঃ ১

- রেজিষ্ট্রেশন
- প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী
- আইডিএফ পরিচিতি, এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
- উদ্বোধন

প্রশিক্ষকের জন্য নির্দেশনা

১. প্রশিক্ষনের শুরুতেই সকল প্রশিক্ষনার্থীদের সাথে আন্তরিকভাবে কথা বলতে হবে যেন তারা জড়তা ভেঙ্গে মনোযোগ দিয়ে বিষয়গুলি অনুধাবন করতে পারেন।
২. যতখানি সহজ ভাষায় বোঝানো সম্ভব তার চেষ্টা করা।
৩. প্রশিক্ষনার্থীদের জ্ঞানের ও বোঝার স্তর যেভাবে আছে ততটুকু বোঝাতে হবে।
৪. প্রতিটি বিষয় শুরুর প্রথমেই প্রশিক্ষনার্থীদের কাছে প্রশ্ন করে তাদের অভিজ্ঞতা যাচাই করে নেয়া।
৫. কোন আলোচনার পর তাদের কাছে প্রশ্ন করে দেখতে হবে তারা কতটুকু বুঝতে সক্ষম হয়েছে।
৬. যতটা সম্ভব ব্যবহারিক ও ছবির মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করা।
৭. মডিউলের কথাগুলো হুবহু বলার দরকার নেই, প্রশিক্ষণার্থী গণের বোঝার সক্ষমতা ও প্রশিক্ষণের পরিবেশ অনুযায়ী বলতে হবে ।

প্রশিক্ষনের নীতিমালা

১. সঠিক সময়ে ক্লাশে উপস্থিত হওয়া।
২. ক্লাশে আন্তরিক পরিবেশ বজায় রাখা।
৩. একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
৪. পাশাপাশি কথা না বলা।
৫. এক সঙ্গে সবাই বা একাধিক জনে কথা না বলা।
৬. কোন বিষয় না বুঝলে অবশ্যই তা প্রশ্ন করে জেনে নেয়া।
৭. কেউ প্রশ্ন করতে চাইলে তাতে বাঁধা না দেয়া।

আইডিএফ পরিচিতি

ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন "আইডিএফ" গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী এন্ড ফার্মস এর সোসাইটিজ ACT XXI OF ১৮৬০ এর অধীনে রেজিষ্ট্রিকৃত এস-১৫৫১(১১১)/৯৩ একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়াও আইডিএফ বাংলাদেশ সরকারের এন.জি.ও বিষয়ক ব্যুরো (নিবন্ধন নম্বর ঃ ৯৪১,তারিখ ২৮/০৫/১৯৯৫ইং) এবং মাইক্রো-ক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (সনদ নংঃ-০১৯২০-০১৮৭২-০০২৪৯,তারিখ-১৪/০৫/২০০৮ইং) তে নিবন্ধন প্রাপ্ত। বিনা জামানতে পার্বত্য অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও সুবিধা বঞ্চিত এলাকার জনগণকে ঋণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে দারিদ্রের দুষ্ট চক্র থেকে মুক্ত করতেই এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু। ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে আইডিএফ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কর্মকান্ড শুরু হয় ১৯৯৩ থেকে। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী ছাড়াও এ সংস্থা কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেনিটেশন, বিশুদ্ধ পানি, উন্নত চুলা, পশু মোটাতাজাকরণ, সৌরশক্তি, মৎস্য ও ভিক্ষুক কর্মসূচী পরিচালনা করছে।

বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ঢাকা,রাজশাহী, নাটোর, গাজীপুরসহ মোট ১৩ টি জেলায় ৭৮ টি শাখা অফিসের মাধ্যমে অত্র সংস্থা ভূমিহীন ও বিত্তহীনদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে তাঁদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী ছাড়াও এ সংস্থা কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উন্নত চুলা, পশু

মোটাতাজাকরন, সৌরশক্তি, মৎস্য ও ডিগনিটি কর্মসূচী পরিচালনা করছে। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর আাওতাধীন জেলা ছাড়াও সৌরশক্তি কর্মসূচী ফেনী, নোয়াখালী, চান্দপুর, কুমিল্লা জেলায় বাস্তবায়ন হচ্ছে ।

আইডিএফ-এর প্রতিষ্ঠাতা জনাব জহিরুল আলম। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিষয়ে পড়াশোনা কালেই গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের উন্নয়ন কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ও জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থায় চাকুরী শেষে ১৯৯২ সালে দেশে ফিরে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ শুরু করেন। নোবেল বিজয়ী ড ঃ মোহাম্মদ ইউনূস, তাঁর সহকর্মী, শিক্ষক, বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীগণ এ সময়ে তাঁকে এ কাজে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা যোগান। ১৯৯৩ সালে গ্রামীণ ট্রাস্টের সহযোগীতায় বান্দরবান জেলার সুয়ালক মৌজায় “সুয়ালক শাখা” শাখার মাধ্যমেই এই প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম শুরু হয়।

সেসন ঃ ২

- ভূমিকা
- আদা হলুদ চাষের গুরুত্ব
- আদা ও হলুদের জাত পরিচিতি
- পার্বত্য অঞ্চলে আদা হলুদ চাষের সম্ভাবনা

ভূমিকা ঃ

আদা ও হলুদ বাংলাদেশের মানুষের নিকট খুবই প্রয়োজনীয় মসলা ফসল হিসাবে পরিচিত। আদা ও হলুদ প্রধান অর্থকরী ফসলসমূহের অন্যতম। বিভিন্ন ধরনের রন্ধনে আদা ও হলুদ একটি উৎকৃষ্ট এবং প্রচলিত মসলার উপকরন। আদা ও হলুদের ঔষধী গুনও রয়েছে। এগুলো হজমীতে সহায়তা করে।নানা প্রকারের আচার, চাটনি, কেচাপ এবং মিষ্টিযুক্ত খাদ্য তৈরীতে আদা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই বাংলাদেশে মসলা জাতীয় ফসলের গুরুত্ব অপরিসীম। এদেশের মানুষ মূলত রান্না করা খাবার বেশি খায় আর রান্নার স্বাদ বাড়াতেই খাদ্যদ্রব্যে নানা ধরণের মসলা ব্যবহার হয়ে থাকে।

আদা হলুদ চাষের গুরুত্ব ঃ

মসলা ফসলের মধ্যে হলুদ ও আদার ঔষধ শিল্পেও ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বর্তমানে দেশে মসলা ফসল- হলুদ, আদা উৎপাদন ও চাহিদার মাঝে যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। হলুদ, আদার ব্যাপক চাহিদার কারণে বিপুল অর্থ ব্যয়ে এসব বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। International Trade Centre, 2011 এর হিসাব অনুযায়ী, ২০১০ সালে বাংলাদেশ ৬,২২৫ মেট্রিক টন হলুদ এবং ২৬,৯৯৫ টন আদা আমদানি করে। তখনকার বাজার মূল্যে আমদানিকৃত হলুদের দাম ছিল ৮৫,৭১০০০ ডলার বা ৬৬ কোটি টাকা (১ডলার=৭৭ টাকা) এবং আদার দাম ছিল ৪,১৯,৯৭০০০ ডলার বা ৩২৩ কোটি টাকা। International Trade Centre, 2011 আরও উল্লেখ করে যে, বাংলাদেশে হলুদের চাহিদা বৃদ্ধির বাৎসরিক হার ৯% এবং মূল্য বৃদ্ধির হার ৪০-১৩৫% আর আদার বাৎসরিক চাহিদা বৃদ্ধির হার ২৫% এবং মূল্য বৃদ্ধির হার ৪১-৭৪%। উল্লেখ্য যে শুধু দেশীয় বাজারই নয় মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, মালেশিয়া, সিঙ্গাপুর এবং আরো কিছু দেশ যেখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশী নানা পেশাজীবি ও শ্রমিক রয়েছে তাদের কাছে দেশীয় হলুদ আদার চাহিদা অনেক বেশি। ইতিমধ্যে প্রাণ গ্রুপ, বিডি ফুডস এবং আরো কয়েকটি কোম্পানি প্রক্রিয়াজাত হলুদ ও আদা রপ্তানি শুরু করেছে।

ছবি ঃ বিক্রির জন্য স্তুপাকারে রাখা হলুদ

ছবি ঃ বিক্রির জন্য সাজিয়ে রাখা আদা

আদার জাত ঃ

বাণিজ্যিক আদার মধ্যে বোল্ড জামাইকা, কালিকাট বা কোচিন, জাভানিজ এবং ওয়েষ্ট আফ্রিকান প্রধান। বাংলাদেশে আদা উৎপাদনের স্থান অনুসারে বারি-১,রংপুরী,খুলনা,টেঙ্গুরা ইত্যাদি নামে পরিচিত।

বারি -১

এই জাতের গাছের গড় উচ্চতা ৭৯-৮২ সে.মি. প্রতি গাছে টিলার সংখ্যা ৩০-৩২ টি ও পাতার সংখ্যা ২১০-২১২টি। প্রতি গাছে প্রাইমারি রাইজোমের সংখ্যা ৩৯০-৩৯৫ টি পর্যন্ত হতে পারে। রাইজোম লাগানো থেকে উত্তেলন পর্যন্ত প্রায় ৩০০ - ৩১০ দিন সময় লাগে। জাতটির রোগ প্রতিরোধ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা ভাল। গড় ফলন প্রতি হেক্টরে ৩০-৩২ টন।

হলুদের জাত ঃ

সিন্দুরী ঃ

স্থানীয় জাতের তুলনায় ফলন দ্বিগুণ ।গাছের উচ্চতা ৬০-৭০ সে.মি. ।বপনের পর থেকে প্রায় ২৭০দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ করা যায়। হলুদের ছড়ার আকার মাঝারি । শাঁস আকর্ষণীয় গাঢ় হলুদ।হেক্টও প্রতি ফলন ২০-২৫ টন।
প্রতি ১০ কেজি শুকনো হলুদ তৈরিতে ৪০ কেজি কাঁচা হলুদ প্রয়োজন হয়(১ঃ৪) ।এ জাত লিফ ব্লাইট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন।

ডিমলাঃ

স্থানীয় জাতের তুলনায় ডিমলার ফলন প্রায় তিনগুণ।গাছ উচ্চতায় প্রায় ১০৫-১২০সে.মি. ।বপনের পর প্রায় ৩০০ দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ করা যায়।
হলুদের ছড়ার আকার চওড়া।হেক্টর প্রতি ফলন ২৮-৩২ টন।প্রতি ৮ কেজি শুকনো হলুদ পেতে ৪০ কেজি কাঁচা হলুদের প্রয়োজন হয় (১ঃ৫) ।এ জাত লিফ ব্লাইট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন।
হলুদের জীবনকাল ২৭০-৩০০ দিন।

পার্বত্য অঞ্চলে আদা হলুদ চাষের সম্ভাবনা ঃ

বাংলাদেশের আবহাওয়া হলুদ ও আদা উৎপাদনের জন্য খুবই উপযোগী। বিশেষ করে পাবর্ত্য চট্রগ্রাম অঞ্চল। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী ২০১০-১১ সালে দেশে মোট ২৩ হাজার হেক্টর জমিতে হলুদ এবং ৯ হাজার ৩০০ হেক্টর জমিতে আদা চাষ হয় এবং ১,২৫,০০০ টন হলুদ ও ৭৪,০০০ টন আদা উৎপাদন হয়। পার্বত্য চট্রগ্রামের তিনটি জেলায় ২০১০-১১ সালে ৪,৯৪৩ হেক্টর জমিতে হলুদ ও ২,৯৫৩ হেক্টর জমিতে আদা চাষ হয় এবং

যথাক্রমে ২৭,০৯৮ টন হলুদ ও ১৮,৭৪১ টন আদা উৎপাদন হয়। পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট যে, আয়তনের দিক থেকে দেশের ২১% হলুদ ও ৩২% আদা চাষ হয় তিন পাবর্ত্য জেলায় এবং উৎপাদন হয় দেশীয় মোট উৎপাদনের ২১% হলুদ ও ২৫% আদা। পার্বত্য অঞ্চলে হলুদ ও আদার গড় ফলন যথাক্রমে ৫.৫ টন ও ৬.৩ টন/হেক্টর। কৃষি প্রযুক্তি হাত বই (৬ষ্ঠ) সংস্করণ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মতে উন্নত জাতের হলুদ যেমন বারি হলুদ-১ (ডিমলা) ২৮-৩২ টন/হেক্টর, বারি হলুদ-২(সিন্দুরী) ২০-২৫টন/হেক্টর, বারি হলুদ-৩, ২৫-৩০ টন/হেক্টর, বারি হলুদ-৪, ২৮-৩০ টন/হেক্টর,বারি হলুদ-৫, ১৮-২০ টন/হেক্টর এবং বারি আদা-১, ২০-২৫ টন/হেক্টর উৎপাদন সম্ভব। উন্নত জাতের বীজের অভাব, চাষাবাদের সঠিক জ্ঞান না থাকা, ফসল সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে জ্ঞানের অভাব, প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাব এবং অন্যান্য কৃষি উপকরণের অপ্রাপ্যতার জন্য সর্বোপরি উৎপাদিত ফসলের সঠিক বাজার মূল্য না পাওয়ায় সক্ষমতার চেয়ে পাবর্ত্য অঞ্চলে হলুদ ও আদার উৎপাদন অনেক কম। অথচ চাষাবাদের আধুনিক কলা কৌশল সর্ম্পকে চাষীদের অভিজ্ঞ করে তুলতে পারলে, উন্নত জাতের বীজের সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারলে, ফসল সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে দিলে, আদা সংরক্ষণের জন্য কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন এবং মার্কেট চেইন উন্নয়নের মাধ্যমে ন্যায্য বাজার মূল্য নিশ্চিত করতে পারলে শুধু মাত্র তিন পার্বত্য জেলায় উৎপাদিত হলুদ আদার জন্যই ৫০০-৬০০ কোটি টাকার আমদানি খরচ কমানো সম্ভব পাশাপাশি হলুদ ও আদা চাষে যুক্ত পাহাড়ের ২৫-৩০ হাজার কৃষক পরিবারের জীবনমান উন্নয়নও সম্ভব হবে। পার্বত্য অঞ্চলে হলুদ আদার উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি মার্কেট লিংকেজ করতে পারলে স্থানীয়ভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্দ্যোক্তার সৃষ্টি হবে।

ছবি ঃ পাহাড়ে আদা ক্ষেতের পরিচর্যা ও আদা সংগ্রহ

সেসন ঃ ৩

- আদা হলুদ চাষের জন্য জমি নির্বাচন
- কন্টুর পদ্ধতিতে চাষের বেলায় বিবেচ্য বিষয়: - জমি তৈরী, মাটির ক্ষয়রোধে হেজ প্ল্যান্ট লাগানো

আদা ঃ

মাটি:

আদার জন্য জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দোঁআশ ও বেলে দোঁআশ মাটি উপযুক্ত। তুলনা মূলক ভাবে ঝুরঝুরে মাটিতে আদার বৃদ্ধি ও ফলন এই দুই বেশি হয়ে থাকে।

মাটি শোধন

একর প্রতি ১০ কেজি কার্বোফুরান ৫জি আদা রোপনের নালায় প্রয়োগ করে জমি শোধন করা হয়।

জমি তৈরী:

জমি লম্বা ও আড়াআড়ি ভাবে ৫-৬ টি চাষ ও মই দিয়ে মাটির ঢেলা ভেঙ্গে ভাল ভাবে ঝুরঝুরে করে তৈরি করতে হয়। জমিতে আগাছা ও শিকড় ইত্যাদি থাকলে তা উপড়ে ফেলে জমি পরিষ্কার করতে হবে। এরপর ৪

মিটার দৈর্ঘ্য এবং ১.৫ মিটার প্রস্থের বেড তৈরি করে তার চারদিকে ১ ফুট গভীর নালা তৈরি করতে হবে। উক্ত নালার মাটি বেডের উপর দিয়ে বেডকে আর ও উঁচু করতে হবে। পানি সেচ ও নিষ্কাষনের জন্য দুটি বেডের মাঝখানের নালা ৫০ সেঃমিঃ প্রশস্ত হলে ভাল হয়।

কন্টুর পদ্ধতি:

সাধারণত ঢালসম্পন্ন পাহাড়ি এলাকায় যেখানে জমির ঢাল ৩% এর বেশি হয় সেখানে এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। ঢালু, বন্ধুরতা ও উচ্চতা অনুসারে ভূমি থেকে পাহাড়ের ঢালে মোটামুটি সমান উচ্চতায় সারিবদ্ধভাবে গাছ লাগানোর পদ্ধতিকে কন্টুর পদ্ধতি বলা হয়। সেখানে ভূমিক্ষয়ের সম্ভাবনা থাকে এবং সেচ দেয়া অসুবিধাজনক সেখানে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে সাধারণত রোপিত গাছের পারস্পরিক দূরত্ব কখনও সমান থাকে না।

আদা বপনের সময় ঃ

গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টিপাত আরম্ব হওয়ার সাথে সাথেই জমি তৈরি করে এপিল- মে(চৈত্র-বৈশাখ) মাসে আদা লাগাতে হয়

বীজ আদার আকার ও হার ঃ

গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, ৪০-৪৫ গ্রাম আকারের বীজ আদা ব্যবহার করে অর্থনৈতিক ভাবে লাভজনক ফলন পাওয়া যায়। এই জন্য হেক্টর প্রতি প্রায় ২৮০০ -৩২০০ কেজি বীজ আদার প্রয়োজন হয়। এই জন্য রাইজোম কে সাবধানে ২.৫-৫ সি.মি. দৈর্ঘ্যের দুই চোখ বিশিষ্ট ৪০-৪৫ গ্রাম ওজনের খন্ডে কেটে দিতে হবে।

বীজ আদা শোধন ঃ

প্রায় ৮০ লিটার পানিতে ১০০ গ্রাম ডায়থেন এম-৪৫ বা ব্যাভিষ্টিন বা ১৬০ গ্রাম রিডোমিল গোল্ড এম জেড-৪৫ মিশিয়ে তার মধ্যে ১০০ কেজি বীজ আদা ৩০-৪০ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে। এরপর ভেজা আদা পানি থেকে উঠিয়ে ছায়ায় রেখে শুকিযে জমিতে রোপন করতে হবে।

আদা রোপন পদ্ধতি ঃ

সরু লাঙ্গল দিয়ে ৫০ সে.মি. দূরত্বে ৫-৬ সি.মি. গভীর সারি করে ২৫ সে.মি. ব্যবধানে বীজ আদা লাগাতে হবে। নির্ধারিত বীজ লাগাবার পূর্বে ঠান্ডা ও ছায়া যুক্ত স্থানে বারির উপর স্তুপ করে রাখলে ২-৩ মাসের মধ্যে অম্কুরোধগম হয় এবং ইহা বীজ হিসাবে লাগাতে হয়।

হলুদের কন্দ রোপন পদ্ধতি ঃ

জমিতে হলুদ দুই ভাবে রোপন করা যায়। বেড পদ্ধতি (উঁচু বা সমতল পদ্ধতি)।

ভ্যালি পদ্ধতি ঃ

হলুদের রোপন পদ্ধতি নির্ভর করে মাটির ধরণ বা বৃষ্টি পাতের উপর। নালা পদ্ধতির চেয়ে ভ্যালি পদ্ধতিতে প্রায় ৫০ ভাগ বেশি ফলন পাওয়া যায়। যেখানে পানি স্বাভাবিক পদ্ধতিতে নিষ্কাশিত হয় না সেখানে এ পদ্ধতিতে হলুদ রোপন করা হয়। ৪০-৫০ সে.মি. দূরে দূরে সারি চিহ্নিত করে সারির মাঝে ২৫ সে.মি. পর পর বীজ কন্দ স্থাপন করতে হয়। এর পর দু সারির মাঝের জায়গা থেকে কোদালের সাহায্যে মাটি তুলে বীজ কন্দে উপর দিতে হয়। এতে বীজ কন্দের ওপর ১২-১৫ সে.মি. উঁচু ভ্যালি বা রিজ তৈরি হয়। দু’সারি ভেলীর মাঝের মাটি তুলে নেয়ায় নালার সৃষ্টি হয়, যা সেচ ও নিকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিতে হলুদের ফলন ভালো হয়। কারন ভ্যালীর মাটি নরম বলে হলুদের নতুন ছড়া বেশি বের হয় ও আকারে বড় হয়। অন্যদিকে হলুদ সংগ্রহ সহজ হয়। এ পদ্ধতির অসুবিধা সমূহের মধ্যে

অন্যতম হলো , বীজ কন্দ রোপনের পর পরই বৃষ্টি হলে ভ্যালির মাটি ধূয়ে জমির সমতলে বা নালায় চলে যায় বলে নতুন করে ভ্যালি তৈরি করতে খরচ বাড়ে।

নালা পদ্ধতি ঃ

এই পদ্ধতিতে ৪৫-৬০ সে.মি. দূরে দূরে লাঙ্গল দিয়ে জমিতে৭-১০ সে.মি. গভীর নালা তৈরি করে নালার মধ্যে বীজ কন্দ নির্দিষ্ট দূরত্বে (২৫ সে.মি.) স্থাপন করে ঝুরঝুরে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। আগে অংকুরিত করা বীজ কন্দ থেকে রোপনের ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে বা অংকুরিত না হওয়া বীজ কন্দ থেকে ৬-৭ সপ্তাহের মধ্যে পাতা গজিয়ে মাটির উপরে উঠে আসে। এ পদ্ধতির সুবিধা হলো শুকনো মৌসুমে সেচের পর অনেক দিন পর্যন্ত মাটিতে রস থাকে। বীজ কন্দের ওপর থেকে সহজে মাটি সরে যায় না। এ পদ্ধতিতে হলুদের ছড়ার বৃদ্ধি কম হয়। বৃষ্টির বা সেচের পর কিছুটা এঁটেল ধরনের মাটি শক্ত হয়ে যায়, এতে ছড়া ছোট হয়। বৃষ্টি বেশি হলে বা নিকাশ ব্যবস্থা ভালো না হলে মাটিতে রসের আধিক্য হওয়ায় কন্দ পচা রোগ দেখা দেতে পারে।

সেসন ঃ ৪

- **আদা হলুদ ক্ষেতে মালচ হিসেবে কচুরিপানা ব্যবহার**
- **সার হিসেবে কচুরিপানার ব্যবহার**
- **জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ**

আদা ফসলে মালচিং ঃ

আদা রোপনের পর পাতা/ খড়/কচুরি পানা দিয়ে জমি মালচিং করা হয়। এত জমির রস সংরক্ষিত থাকে ও ভূমি ক্ষয় রোধ হয়। কিছু দিন পর এসব পাতা/খড় পচে গিয়ে জমিতে জৈব উপাদান বৃদ্ধি করে। তাছাড়া ধৈঞ্চা, কলাই, রাই, মুগ, শীম, বরবটি ইত্যাদি গাছের ছায়ায় আদা চাষ করে মালচিং এর সুবিধা পাওয়া যায়।

হলুদ ক্ষেতে মালচিং ঃ

হলুদ ক্ষেতের বেডে মালচিং করার প্রয়োজন হয়। মালচিং দু'বারে করতে হয়। প্রথমবার রোপনের পর পরই এবংদ্বিতীয় বার রোপনের ৪৫ দিন পর। প্রথম মালচিং মাটির রস ধারন ক্ষমতা বাড়ায় ও বীজ কন্দকে গজাতে সাহায্য করে। দ্বিতীয় মালচিং এর প্রয়োজন হয় আগাছা নিড়ানো ও উপরি সার প্রয়োগ করার পর। দ্রুত পচে এমন দ্রব্য মালচিং কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। সবুজ পাতা দিয়ে মালচিং করলে ভালো হয়। সবুজ পাতা পাওয়া না গেলে শন পাট, ধৈঞ্চা বা ডাল জাতীয় শস্য ভ্যালী বা বেডের চারধার দিয়ে বপন করতে হয়।

সার হিসেবে কচুরিপানার ব্যবহার ঃ

আদা ফসলে জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ ঃ

ভাল ফলন ফেতে হরে হেক্টর প্রতি নিম্ন উল্লেখিত পরিমানে রাসায়নিক ও জৈব সার জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

সারের নাম	পরিমাণ	শেষ চাষের সময় প্রয়োগ	পরবর্তী পরিচর্যা হিসাবে প্রয়োগ		
			১ম কিস্তি	২য় কিস্তি	৩য় কিস্তি
গোবর	৫টন	সব	-	-	-
ইউরিয়া	৩০৪ কেজি	-	১৫২ কেজি	৭৬ কেজি	৭৬ কেজি
টি এস পি	২৬৭ কেজি	সব	-	-	-
এমও পি	২৩৩ কেজি	১১৬ কেজি	-	৫৯ কেজি	৫৮ কেজি
জিংক সালফেট	৩ কেজি	সব	-	-	-
জিপসাম	১১০ কেজি	সব	-	-	-
বোরিক এসিড	৩-৬ কেজি	সব	-	-	-

জমি চাষের সময় গোবর, টিএসপি, অর্ধেক এমপি, জিপসাম এবং জিংক মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। অর্ধেক ইউরিয়া আদা রোপনের ৫০ দিন পর জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া ও এমও পি সমানভাগে দুই কিস্তিতে রোপনের যথাক্রমে ৮০ ও ১০০ দিন পর জমিতে পার্শ্ব প্রয়োগ করতে হবে। এই সময় গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে।

হলুদ ফসলে জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ ঃ

জমি তৈরী ঃ

হলুদের জন্য জমি তৈরিতে৪-৫টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে জমির উপরি ভাগ সমান করতে হয়। চাষ ও মই এমন ভাবে দিতে হয় যেন বড় বড় ঢেলা ভেঙ্গে যায়। মাটি মোটামুটি ঝুরঝুরে হয়। এরপর ঘাস বা আগাছা বা আগের ফসলের অবশিষ্টাংশ পরিস্কার করে জমি তৈরি করতে হবে।

সারের পরিমান ঃ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	২০০-২৪০ কেজি
টি এস পি	১৭০-১৯০ কেজি
এম পি	১৬০-১৮০ কেজি
জিপসাম	১০৫-১২০ কেজি
জিংক অক্সাইড	২-৩ কেজি
গোবর	৪-৬ টন

সার প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ

জমি তৈরির সময় অর্ধেক ইউরিয়া ,সমুদয় গোবর,টিএসপি,এমপি,জিপসাম ও জিংক অক্সইড সার প্রয়োগ করতে হবে। বাকি ইউরিয়া কন্দ লাগানোর ৮০ এবং ১১০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

সেসন ঃ ৬

- আদা হলুদের রোগ ব্যবস্থাপনা
- আদা হলুদের পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা

আদার রোগ ও তার নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থাপনা ঃ

ব্যাকটেরিয়া জনিত ঢলে পড়া বা ব্যাকটেরিয়াল উইল্ট ঃ

ব্যাকটেরিয়া দিয়ে আদার এ রোগটি হয়। রোগটি বীজ ও পানির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে।

রোগের লক্ষণ ঃ

- প্রথমে একটি গাছ বা ক্ষুদ্র অংশের পাতা নিচের দিকে কুঁকড়িয়ে যায়।
- পাতা দ্রুত কমলা - বাদামী বা সোনালী - বাদামী বর্ণ ধারণ করে।
- পাতা নিচের দিকে ভেঙ্গে যায়।
- কন্দের কাছাকাছি অংশে কান্ডে গাঢ় পানি ভেজা দাগ হয়।
- কান্ড কন্দ থেকে খুব সহজেই ভেঙ্গে আসে।
- কান্ড কেটে পানিতে দিলে সাদা পদার্থ বের হয়।
- পচা কান্ডে দুর্গন্ধ হয়।
- কন্দ কাটলে দুধের ন্যায় তরল পুঁজ বের হয়। কন্দের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা

- ধানের সাথে শস্য পর্যায় করলে এ রোগ নিয়ন্ত্রন করা যায়।
- রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হয়।
- পানি নিকাশ ব্যবস্থা খুব ভাল রাখতে হয়।
- অন্য আদা ক্ষেতের পানি যেন সরাসরি প্রবেশ না করে সে দিকে সতর্কভাবে লক্ষ্য রাখতে হয়।
- আদার ক্ষেতে মানুষ ও অন্য জীবজন্তুর চলাচল নিয়ন্ত্রন করার প্রয়োজন হয়, কারণ এদের পায়ের বা শরীরের অংশ আক্রান্ত অংশ লেগে সুস্থ ক্ষেতে বা একই ক্ষেতের অন্য অংশে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

নরম পচা ঃ

ছত্রাক দিয়ে আদার এ রোগটি হয়। রোগটি বীজ ও পানির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে।

রোগের লক্ষণ ঃ

- কচি গাছের অংশ , কন্দের চোখ , মুকুল এবংছোট শিকড়ে আক্রমণ করে।
- পাতা নীচ থেকে উপরের দিকে হলুদ হয়ে যায়।
- পাতা ভেঙ্গে পড়ে এবং পাতা সহজেই তুলে ফেলা যায়।
- কন্দের উপরের দিকের চোখ পচে যায়।
- প্রথম দিকে আক্রমণ হলে পুরো কন্দ পঁচে যায়।

শুকনো পচা ঃ

ছত্রাক দিয়ে আদার এ রোগটি হয়। যেহেতু নেমাটোড মাটিতে অবস্থান করে তাই রোগটি মাটির মাধ্যম দিযে বিস্তার লাভ করে।

রোগের লক্ষন ঃ

- গাছ দ্রুত মারা যায়। নিচের পাতায প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায়।
- নেমোটেড কন্দ আক্রমন করে এবং ভিতরে গর্ত করে ফেলে।
- কন্দের উপরিভাগ বাদামী শুকনো আবরনে ঢেকে যায়।
- অনেক সময় কন্দের নিচের দিকে বাদামী শুকনো আবরনে ঢেকে যায় ফলে বাজার মূল্য কমে যায়।
- অন্য জীবাণূ (বিশেষ করে ছত্রাক) প্রবেশে সহাযতা করে।
- রাইজোম যখন সংরক্ষণ করা হয় তখন ছত্রাক দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং রাইজোমকে পানি শূণ্য করে ফেলে ফলে আদা কুঁকড়িয়ে যায়।

নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থাপনা ঃ

- নরম পচা ও শুকনো পচা এ রোগ দুটি একে অপরের সাথে সম্পর্কিত বিধায় এদের নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থাপনা এক সাথে নিলে ভাল হয়।
- বীজ শোধন করতে হয়(গরম পানি ও ছত্রাকনাশক - মেটালিক্সিল ও ম্যানকোজেব এরসমন্বয়ে)
- রোগ মুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হয়।
- শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হয়।

হলুদের রোগ ও তার নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থাপনা ঃ

পাতায় দাগ রোগ ঃ

এ রোগ সাধারণতঃ আগষ্ট -সেপ্টেম্বর মাসে দেখা যায়। কোন কোন এলাকায় বা কোন কোন বছর অক্টোবর- নভেম্বর মাসেও দেখা যায়। বাতাসে উচ্চ আর্দ্রতা যখন এক নাগারে অনেক সময ধরে বজায থাকে তখন এ রোগের বিস্তার ঘটে।রোপনের সময় আক্রান্ত বীজ থেকেও প্রাথমিক সংক্রামন হতে পারে। বাতাস, সেচ বা বৃষ্টির পানি এবং অন্যান্য

জৈবিক মাধ্যম দ্বারাও এটি বিস্তার লাভ করতে পারে। এই রোগের যে ছত্রাক সেই ছত্রাক মরিচের পাতায় দাগ ও ফল পচা রোগের ও কারণ, যা বীজ বাহিত। যদি হলুদ ক্ষেতের কাছাকাছি কোন মরিচ ক্ষেত থাকে তাহলে এ রোগ সংক্রমণ বা বিস্তারের সম্ভাবনা বেশি থাকে।

রোগের লক্ষণ ঃ

- পাতায় লম্বা বাদামী দাগ দেখা যায় যার মাঝের অংশ ধূসর রংয়ের হয়। পরবর্তীতে দাগ গুলো কালো দাগে পরিণত হয।
- দাগগুলো ৪-৫ সে.মি. লম্বা ও ২-৩ সে.মি. প্রশস্থ হয়।
- ধূসর অংশ টি পাতরা হয়ে ছিঁড়ে যায়।
- দাগগুলোর চারদিকে হলুদ রংয়ের বলয় দিয়ে ঘেরা থাকে।
- একটি পাতায় অনির্দিষ্ট সংখ্যাক দাগ দেখা যেতে পারে।
- রোগের সংক্রামণ যত বাড়তে থাকে দাগ গুলো ততই বড় হতে থাকে, এক সময় পাতায় অধিকাংশ স্থানেই ছেয়ে ফেলে।
- এ রোগের ছত্রাক এক ধরনের বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন করে যা পাতাকে বিবর্ণ করে ফেলে ।

নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থাপনা ঃ

- রোগমুক্ত এলাকা বা রোগমুক্ত ক্ষেত থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হয়।
- বীজরে জন্য বাছাইকৃত বা সংগৃহীত কন্দ কার্বেন্ডাজিম (১ গ্রাম) বা মেনকোজেব (৩ গ্রাম) জাতীয় ছত্রাক নামক প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে শোধন করতে হয়।
- রোপনের আগে বীজ কন্দ ছত্রাকনাশক দ্রবনে ৩০ মিনিট ডুবিয়ে রেখে পরে ছায়ায় শুকিয়ে নিতে হয়।
- রোগ দেখা দেয়ার পরও কার্যকর ভাবে এ রোগের নিয়ন্ত্রন করতে হলে কার্বেন্ডাজিম ২ গ্রাম বা মেনকোজেব ২.৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হয়।
- আক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলে ক্ষেতে এ রোগের বিস্তার কমানো যায়।
- কপারযুক্ত কুপ্রাভিট ছত্রাকনাশক ৩ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ও এ রোগের বিস্তার নিয়ন্ত্রন করা যায়।
- যদি কোন ক্ষেতে এ রোগ একবার দেখা দেয়, তাহলে শষ্য পর্যায় অবলম্বন করা প্রয়োজন।

পাতা শুকানো বা পাতার ব্লচ রোগ ঃ

বাংলাদেশে অক্টোবর- নভেম্বর মাসে পাতা শুকানো বা লিফ ব্লচ রোগটি দেখা যায়। এ রোগটি ছত্রাক এর কারণে হয়। আর ছত্রাক টি বাতাস দ্বারা ছড়িয়ে পড়ে। প্রাথমিক ভাবে নিচের পাতা প্রথমে আক্রান্ত হয়। পরে আক্রান্ত পাতা শুকিয়ে ঐ শুকনো পাতায় তৈরি রোগের জীবাণু গুলো বাতাসের মাধ্যমে সমস্ত ক্ষেতে বা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। গ্রীষ্মকাল জুড়ে এ ছত্রাক পুরাতন আক্রান্ত পাতা বা ঝরে পড়া পাতায় এবং মাটিতে অবস্থান করে বা বেঁচে থাকে।

রোগের লক্ষণ ঃ

- পাতায় প্রথমে আয়তাকৃতির দাগ দেখা যায়।
- দাগ গুলো ছোট ছোট, ১-২ মিলি মিটার প্রশস্থ হয়।
- পাতার উভয়দিকেই এই দাগগুলো অনেক সংখ্যার হয়, তবে উপরের দিকে বেশি হয়।
- দাগ গুলো শিরা বরাবর লম্বালম্বি ভাবে বাড়তে থাকে। অনির্দিষ্ট আকার ধারণ করে মুক্তভাবে বাড়তে থাকে।
- প্রথম দাগটি হালকা হলুদ হয়ে পাতার রং নষ্ট করে দেয় ও শুকিয়ে যায়।
- অনেক সময় এতে গাছের পাতা ঝরে যায়।

নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থাপনা ঃ

- রোগমুক্ত এলাকা থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হয়।

- বীজ কন্দ অবশ্যই ৩ গ্রাম মেনকোজেব বা ১ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩০ মিনিট ডুবিয়ে রেখতে হয়। এর পর মিশ্রন থেকে তুলে ছায়ায় শুকাতে হয়।
- রোগ দেখা দেয়ার পর মেনকোজেব ২.৫ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম ১ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হয়।
- আক্রান্ত, শুকনো বা পুরনো পাতা ক্ষেতে থেকে সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হয় । এতে মাঠে ছত্রাকের উৎস্য কমানো যায়।
- হলুদ চাষের বেলায় শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হয়।

কন্দ পচা ঃ

এ রোগ টি হলুদের জন্য মারাত্নক সমস্যা। সতর্ক না থাকলে এ রোগের কারনে প্রচুর ক্ষতি হতে পারে। এ রোগটি মাটি ও বীজ বাহিত। ক্ষেতের আক্রান্ত বা অবশিষ্টাংশ দিয়েও পরবর্তীতে বিস্তার লাভ করে।সময় মত ব্যবস্থা না নিলে কন্দের মাছি দ্বারা এ রোগটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পরে।

রোগের লক্ষণ ঃ

- হলুদ গাছের পাতার কিনারা বরাবর শুকাতে শুরু করে।
- পাতার বোঁটার কাছাকাছি অংশ ভেজা ভেজা ও নরম হয়ে যায় এবং পাতা বা গাছ হেলে পড়ে।
- এর ফলে কন্দ ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং পচে যায়।

নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থাপনা ঃ

- রোগমুক্ত এলাকা বা ক্ষেত থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হয়।
- ক্ষেতে যেন পানি এক টানা জমে না থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়।
- হালকা বুনটের মাটিতে এ রোগ কম হয় বলে হলুদ চাষের সময় জমি নির্বাচনে সে ধরনের মাটিই নির্বাচন করতে হয়।
- জমির নিকাশ ব্যবস্থা ভালো রাখতে হয়।
- হলুদ চাষের বেলায় শস্য পর্যায় অনুসরন করতে হয়।
- গরমের সময় হলুদ চাষের আগে জমি গভীর চাষ দিতে হয় এবং মাটি সৌরতাপে বেশ কিছুদিন শুকাতে হয়।
- আক্রান্ত গাছ তুলে নষ্ট করে ফেলতে হয়।
- ভ্যালী বা নালা পদ্ধতিতে চাষ করলে এ রোগ কম হয়।
- আক্রান্ত গাছের গোড়ায় মেনকোজেব ৩ গ্রাম বা ডাইথেন এম- ৪৫ ৩ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হয়।
- এ রোগের নিয়ন্ত্রনে বীজ শোধন জরুরী। কার্বেন্ডাজিম ১ গ্রাম বা মেনকোজেব ৩ গ্রাম বা মেটালাক্সিল ২.৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে মিশ্রণে বীজ কন্দ ১ ঘণ্টা ডুবিয়ে রেখে পরে ছায়ায় শুকাতে হয়। বীজ সংরক্ষনের আগে বা রোপনের আগে বীজ শোধন করতে হয়।

আদা হলুদের পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা ঃ

আদার পোকা ও তার নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থাপনা

সাদা গ্রাব ঃ

সাদা গ্রাব বা সাদা কীড়া আদার শিকড় খেয়ে বেচেঁ থাকে। এরা মাটির নিচেই থাকে।

ক্ষতির ধরণ ঃ

- মাটির কাছাকাছি কান্ড হালকা হলুদ বর্ন ধারণ করে।
- পাতা টান দিলে সহজেই উঠে আসে।
- গোড়ার পাতা বা কান্ড কুঁচকিয়ে যায়।
- গাছের বৃদ্ধি থেমে যায়।
- ফসল সংগ্রহের সময় ক্ষতির মাত্রা বুঝা যায়।

এ জন্য উপরের লক্ষণ গুলো দেখা দেয়া মাত্র আদা গাছের গোড়া খঁড়ে এ পোকার আক্রমণ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হয়। সময়মত ব্যবস্থা না দিলে অনেক সময় পুরো আদার কন্দই নষ্ট হয়ে যায়।

নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থাপনা ঃ

প্রথম ভারী বৃষ্টিপাতের পর পুরো ক্ষেত জুড়ে ক্লোরোপাইরিফস জাতীয় কীটনাশক (৫ মি.লি./ লিটার) স্প্রে করা আক্রান্ত গাছের গোড়ার আশেপাশের মাটি খুঁড়ে পূর্ণাঙ্গ পোকা ধরে মেরে ফেলা।

হলুদের পোকা ও তার নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থাপনা ঃ

কান্ড ছেদক পোকা ঃ

এরা হলুদের জন্য একটি মারাত্বক পোকা। মথ দেখতে কমলা হলুদ রংয়ের। পোকার দুই পাখাতেই কালো দাগ থাকে। পাতা ও গাছের অন্য নরম অংশে ডিম পারে। কীড়া দেখতে লালচে বাদামী ও গায়ে কালো ফোটা দাগ থাকে।

ক্ষতির ধরণ

- কীড়া মাটির উপরের প্রধান কান্ড কে ছিদ্র করে ভেতরের অংশ খায়।
- কান্ডে ছিদ্র ও ছিদ্রের পাশে কীড়ার মল দেখা যায়।
- কান্ডের মাঝের পাতাগুলো মরে যায়।
- এতে গাছ প্রথমে হলুদ ও পরে শুকিয়ে যায়।

নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থাপনা ঃ

ম্যালাথিয়ন বা ডাইমেথোয়েট গ্রুপের কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১ মাস পর পর জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত হলুদ ক্ষেতে স্প্রে করতে হয়।

কন্দের স্কেল পোকা ঃ

পোকাগুলো গাছে এক জায়গায় একত্রে থাকে। দেখতে কিছুটা বাদামী সাদার মিশ্রণ। পোকাগুলো গুদামে কন্দের গায়ের সাথে লেগে থাকে।

ক্ষতির ধরণ ঃ

- হলুদ ক্ষেতে বা হলুদ গাছে একত্রে অনেকগুলো স্কেল পোকা গাছের রস চুষে খায়।
- এরা গুদামজাত করে রাখা কন্দেরও রস খায়।
- এতে মাঠের গাছ ও সংরক্ষণের জন্য রাখা কন্দ শুকিয়ে যায়।

নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থাপনা ঃ

- রোপনের আগে সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান বড় আকারের কন্দ বাছাই করতে হয়।
- ম্যালাথিয়ন গ্রুপের কীটনাশক ৫ মিলিলিটার ও কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে মিশ্রণে ৩০ মিনিট কন্দ ডুবিয়ে রাখতে হয়। পরে মিশ্রণ থেকে কন্দ তুলে ছায়ায় শুকিয়ে রোপনের জন্য সংরক্ষণ করতে হয়।

কন্দের মাছি ঃ

অক্টোবর থেকে শুরু করে হলুদ সংগ্রহ করা পর্যন্ত এ পোকা দেখা দেয়।

ক্ষতির ধরণ

- কন্দের মাছে দেখতে কালো রংয়ের পিঁপড়ার মতো।
- এরা কান্ডের গোড়ায় ডিম পাড়ে।

- এরা কন্দ পচা রোগে আক্রান্ত কন্দকে আক্রমন করে।
- ডিম ফোটার পর কীড়া কন্দের ভেতরে প্রবেশ করে এবং ভেতরের প্রায় সবটুকু অংশ খেয়ে ফেলে। এতে হলুদের ফলন প্রায় অর্ধেকে নেমে আসে।

নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থাপনা ঃ

- কন্দ পচা রোগে আক্রান্ত কন্দ বীজ হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়।
- রোপনের ১০৫-১৩৫ দিনের মধ্যে কার্বোফুরান ৫জি গ্রুপের কীটনাশক হেক্টরে ১০-১২ কেজি হারে গাছের গোড়া থেকে ১০-১৫ সে.মি. দূরত্বে ও ৫-৭ সে.মি. মাটির গভীরে দিয়ে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়।

পাতা মোড়ানো পোকা ঃ

এটা হলুদের মারাত্বক সমস্যা। এই পোকার মথের রং সাদা - কালো।

ক্ষতির ধরণ

- কীড়া মোড়ানো পাতার ভেতরের অংশ খায়।
- পুত্তলি দশা মোড়ানো পাতার ভেতরেই ঘটে।

নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থাপনা

ক্ষেতে এ পোকার আক্রমন দেখা দিলে ডাইমেথোয়েট ৫ মিলিলিটার প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হয়। হাত দিয়ে সংগ্রহ করে মোড়ানো পাতার ভেতরের কীড়া ও পুত্তলি নষ্ট করতে হয়।

পাতা মোড়ানো পোকা ঃ

এই পোকা গুলো খুবই ক্ষুদ্র আকৃতির। পাখা প্রায় স্বচ্ছ বলে খালি চোখে দেখা যায় না।

ক্ষতির ধরণ ঃ

- পোকা গুলো পাতার রস চুষে খায়।
- এরা পাতার ঠিক নিচে ডিম পাড়ে।
- ডিম ফুটে কীড়া বের হয়েই পাতার রস খাওয়া শুরু করে।
- এতে পাতা মুড়িয়ে যায়এবং হলুদ হয়ে শেষে শুকিয়ে যায়।
- গাছ নষ্ট হয়ে যায় বলে কন্দ গঠন হয় না।
- ফলন মারাত্বক ভাবে কমে যায়।

নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থাপনা ঃ

মাঠে এ পোকা দেখা দিলে ইমিডাক্লোরোপিড ০.৫ মিলিলিটার প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে সপ্তাহে একবার করে ২-৩ বার স্প্রে করতে হয়।

লাল মাকড় ঃ

পাতার নিচের দিকে একসাথে অসংখ্যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল মাকড় থাকে।

ক্ষতির ধরণ ঃ

এরা পাতা থেকে রস চুষে খায়। ফলে পাতার রং বিবর্ণ হয়ে শুকিয়ে যায়।

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা ঃ

সালফারযুক্ত ছত্রাকনাশক ৩ গ্রাম বা ডাইকোফল ৫ মিলিলিটার প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার উপরে বা নিচে স্প্রে করতে হয়; প্রতি শতকে ২ লিটার দ্রবণ পাতায় স্প্রে করতে হয়।

সেসন ঃ ৭

আদা হলুদের সাথে চাষের জন্য সাথী ফসলের জাত নির্বাচন
সাথী ফসল চাষ ব্যবস্থাপনা

আদা হলুদের সাথে চাষের জন্য সাথী ফসলের জাত নির্বাচন ঃ
জাত নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় ঃ

কয়েকটি ফসলের জাত ঃ

যেহেতু আদা হলুদ ছায়াতে বা স্বল্প আলোতে চাষ করা যায় তাই আম বা নারিকেল বাগানে আদা হলুদ আন্তঃফসল হিসাবে চাষাবাদ/করা যায়।

মিশ্র ফসল হিসাবে হলুদের সাথে পেঁয়াজ চাষ করে বেশ ভালো ফলাফল পাওয়া গেছে। বপনের সময় শাক জাতীয় ফসল চাষ করা যায়। গোড়ায় মাটি তোলার সময় উক্ত ফসল সংগ্রহ করা যায়। অক্টোবর নভেম্বর মাসে গাছ শুকিয়ে আসলে মাচা দিয়ে এর উপর লাউ, সীম ফসল চাষ করা যায়।

আদার গাছ আধো ছায়া আধো রোদ পচন্দ করে। রোপনের পর থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ছায়ার প্রয়োজন হয়। আদা রোপনের পর ধৈঞ্চা বীজ ছিটিয়ে দিতে হবে এবং বড় হলে এমনভাবে পাতলা করে দিতে হবে যেন আদার ক্ষেত আধো ছায়া আধো রোদ পায়। আন্তঃ ফসল হিসাবে বেগুন বা মরিচ চাষ করা যেতে পারে।

ক্ষেতের মাঝে মাঝে সজিনা গাছও লাগানো যেতে পারে।

সাথী ফসল চাষ ব্যবস্থাপনা ঃ

সেসন ঃ ৮

- আদা হলুদ ক্ষেতে সেচ ব্যবস্থাপনা
- সাথী ফসলে সেচ ব্যবস্থাপনা

আদা ফসলে সেচ ও নিস্কাশন ঃ

বীজ আদা রোপনের পর ২/১বার সেচের প্রয়োজন হয়।আদা ফসলের পুরো জীবনকাল মাটিতে ৫০% রস থাকা প্রয়োজন। অধিক বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হয়। কোন মতেই আদার জমিতে পানি জমতে দেয়া যায় না।

হলুদ ক্ষেতে সেচ ও নিস্কাশন ঃ

বীজ থেকে চারা গজানো বা মাটির উপরে পাতা গজিযে ওঠা পর্যন্ত সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন সেচ দিতে হবে।তবে লক্ষ্য রাখতে হয যেন কোন অবস্থাতেই ক্ষেতে বা গাছের গোড়ায় পানি জমে না থাকে। ক্ষেতে কতবার পানি সেচ দিতে হয় তা নির্ভর করে মাটির ধরণ বা বুনট বা আবহাওয়ার উপর। হালকা বুনটের মাটি হলে সেচ বেশি লাগে বা ঘন ঘন সেচ দিতে হয়। আর এঁটেল ধরনের মাটি হলে রস অনেক দিন ধরে রাখতে পারে বলে অনেক দিন পর পর সেচ দিলে ও চলে। অন্যদিকে বৃষ্টি হলে সেচের প্রয়োজন কম হয়।এছাড়া মাটির রস কমে গেলে সেচ দেয়া প্রয়োজন।

বর্ষায় অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হয়। পানি জমে থাকলে কন্দ পচা রোগ দেখা দেয়। দু' সারির মাঝের নালা আগাছামুক্ত রাখতে পারলে সেচের সুবিধার পাশাপাশি পানি নিকাশের একটি সুব্যবস্থা হয়ে যায়। নালায় আগাছা থাকলে পানি নিকাশের অসুবিধা ছাড়াও মাটির রস ধরে রাখে, এতে নতুন গাছের শিকড় নষ্ট হতে পারে বা বাড়ন্ত গাছের মোথা বা ছড়ায় পচন দেখা দিতে পারে। সেই জন্য হলুদের জমিতে যেন সব সময়ই পানি নিকাশের সুবিধা থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

সেসন ঃ ৯

- আদা হলুদ সংগ্রহ
- গ্রেডেশন

আদা সংগ্রহ ঃ

ছবি ঃ বিক্রির জন্য আদা বাছাইকরণ(গ্রেডিং)

ছবি ঃ বিক্রির জন্য হলুদ বাছাইকরণ (গ্রেডিং)

পিলাই তৈরি ঃ

আদা রোপনের পর গাছ ও শিকড় গজিয়ে গেলে বীজ আদা তুলে নেওয়া যায়। এত গাছের বৃদ্ধিতে তেমন কোন ক্ষতি হয় না। এই উত্তোলিত বীজ আদা বিক্রি করে আর্থিক ভাবে লাভবান হওয়া যায়। এই পদ্ধতিকে পিলাই তোলা বলে। বীজ আদা লাগানোর সময় সবগুলো বীজের অঙ্কুরিত মুখ একইদিকে রাখতে হয যাতে বীজ আদা রোপনের ৭৫-৯০ দিন পর সারির শুধু মাত্র এক পাশের মাটি সরিয়ে সহজেই পিলাই সংগ্রহ করা যায়। এভাবে খরচের ৫৬-৬০ ভাগ পিলাই থেকে উঠে আসে।

সংগ্রহের উপযোগী সময় ঃ বীজ রোপনের ৭ থেকে ৯ মাসের মধ্যেই আদা তোলা হয়।

সংগ্রহের উপযুক্ত অবস্থা ঃ

পাতা হলুদ হয়ে যায় এবং শুকাতে শুরু করে। পুরো গাছ মরে যাবার পরে আদা সংগ্রহ করলে মান কমে যায় এবং সংরক্ষণ ক্ষমতা হ্রাস পায়। বাজার মূল্য বেশী পাওয়ার জন্য আগাম তোলা যায়। এ ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে ২-১ টি আদা তুলে যদি দেখা যায় কন্দের আকার বাজারজাতকরনের উপযোগী তাহলেই কন্দ তোলা যাবে।

আদা সংগ্রহ কৌশল ঃ

গাছের গোড়ায় মাটি খুব সাবধানে আলগা করে নিতে হবে যেন কন্দ আঘাত প্রাপ্ত না হয়। কান্ড ধরে সতর্কতার সহিত আদা তুলতে হবে যেন কোন ক্ষতির সৃষ্টি না হয়। অতিরিক্ত মাটি ও শিকড় অপসারন করতে হবে। মাঠেই এক ধরণের প্রাক বাছাই করে ক্ষতিগ্রস্থ , রোগাক্রান্ত ও বাজারজাতকরনের অযোগ্য আদা সরিয়ে ফেলতে হবে। বাতাস চলাচল করতে পারে এমন কাঠের / বাশেঁর ঝুড়িতে করে মাঠ থেকে আদা পরিবহণ করতে হবে।

ফলন

প্রতি হেক্টরে ৩০-৩২ টন এবং প্রতি শতকে ১০০-১২০ কেজি।

আদার আন্তঃপরিচর্যা ঃ

আদা রোপনের ৪- ৬ সপ্তাহ পর অর্থাৎ আদা গজানোর পর ফসলের সাথে আগাছার প্রতিযোগীতা রোধ করার জন্য জমির আগাছা নিড়িয়ে দিতে হবে। এই ভাবে যতবার সম্ভব ফসলকে আগাছা মুক্ত করতে হবে। গাছের গোড়ায় মাটি সারি বরাবর ২-৩ বার তুলে দিতে হবে। এর ফলে যে নালা তৈরী হবে তা সেচ ও পানি নিষ্কাশনের কাজে লাগে।

আদার আগাছা নিয়ন্ত্রন ঃ

আদার ভাল ফলন পাওযার জন্যে সর্বমোট ৪ বার আগাছা নিড়ানো উচিৎ ১ম বার রোপনের ৩০-৩৫ দিন পর।

২য় বার ৫০-৫৫ দিন পর পূণরায় আগাছা পরিস্কার করতে হবে।

৩য় বার ৮০-৮৫ দিন পর আরেকবার আগাছা পরিস্কার করতে হবে।

৪র্থ বার ১০০-১২০ দিন পর পূণরায় আগাছা পরিস্কার করা প্রয়োজন।

আদা গাছের গোড়ায় মাটি দেয়া ঃ

আদার রাইজোমের সঠিক বৃদ্ধি এবং পানি নিস্কাশনের জন্য ২-৩ বার আদার দুই সারির মাঝখান থেকে মাটি তুলে সারি বরাবর আদার গাছের গোড়ায় দিতে হবে।

হলুদ এর কন্দ বাছাই ও শোধণ ঃ

সাদারণত ১৫-২০ গ্রাম ওজনের ১-২টি কুঁড়ি বা কুশি বিশিষ্ট কন্দ (মোথা বা ছড়া) বীজ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। রোপনের আগে কন্দ সুস্থ আছে কিনা পরীক্ষা করে নিতে হয়। বিশেষ করে শুকিয়ে যাওয়া বা সামান্য পচা কন্দ বাছাই করে বাদ দিতে হয়। রোপনের আগে বীজ শোধন করে নেয়া ভাল। বীজ শোধনের জন্য কার্বেন্ডাজিম ১ গ্রাম অথবা মেনকোজেব ২.৫ গ্রাম ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে কন্দ গুলো ১০-১৫ মিনিট মিশ্রণে ডুবিয়ে রাখার পর তুলে ছায়ায় শুকিয়ে নিয়ে রোপন করতে হয়। কন্দ ৫-৭ সে.মি. মাটির গভীরে রোপন করতে হয়।

শস্য পর্যায়

বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকাতেই দেখা যায় যে বছরের পর বছন ধরে একই জমিতে হলুদের চাষ করা হচ্ছে।এটি একটি মারাত্নক সমস্যা।এতে শুধু যে জমির উর্বরতা কমে যাচ্ছে তাই নয়, হলুদের জন্য ক্ষতিকর বিভিন্ন পোকামাকড় ও রোগের প্রায় স্থায়ী আবাস গড়ে উঠেছে।

এ কারণে একবার হলুদ চাষের পরবর্তী ২ বছর ঐ জমিতে অন্য ফসল চাষ করা উচিত।

যে সব এলাকার মাটিতে রস বেশি বা অধিকাংশ সময় ভেজা থাকে সে সব এলাকায় হলুদের আগে বা পরে ধান, আখ, কলা বা সবজি চাষ করা ভালো।

আন্তঃ পরিচর্যা ঃ

আগাছা নিয়ন্ত্রণ ঃ

হলুদ ক্ষেত সব সময় আগাছামুক্ত রাখা উচিত। হরুদ রোপনের পর প্রচুর আগাছা বা ঘাস জন্মে। এজন্য রোপনের ১ মাস পর প্রথম বার আগাছা পরিষ্কার করতে হয়। এর পর প্রতি একমাস পর পর চতুর্থ মাস পর্যন্ত ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করতে হয়। এর পরে গাছ বড় হযে যায় বলে আগাছার সংখ্যা কমে যায়।

ছবি ঃ হলুদ গাছের পুষ্টি চাহিদা নিরুপন

হলুদ গাছের গোড়ায় মাটি দেয়া ঃ

প্রথমবার কন্দ থেকে যখন ৩-৪ বার বের হয় তখন সারির দু' পাশের মাটি গোড়ায় তুলে দিতে হয়। দ্বিতীযবার শেষ নিড়ানী দেয়ার পর একই ভাবে সারির দু' পাশের মাটি বাড়ন্ত হলুদ গাছের গোড়ায় দিতে হয়। অবশ্য বৃষ্টি বা সেচের পানিতে গোড়ার মাটি সরে গেলে প্রতিবার নিড়ানীর পর গোড়ায় মাটি দিতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হয় হলুদ গাছের গোড়া যেন উন্মুক্ত না থাকে বা শিকড় বের হয়ে না থাকে।

ফলন

বাংলাদেশে শতক প্রতি গড় ফলন ৪০-৬০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে।